

দৈবাৎ

(গল্পগ্রন্থ - উপলখণ্ড)

গিরীন ঘোষের আড়ত বন্ধ হয় রাত নটায়। সারাদিন খাতা লেখা। ভাল লাগে এ কাজ? কখন খাইয়া-দাইয়া বাড়ি হইতে সে বাহির হইয়াছে। ছোট ছেলেটির অসুখ, বিনয় ডাক্তারকে ডাকার কথা, গিয়াছিল কি না কে জানে। দু টাকা ভিজিট খরচ। তাছাড়া হয়তো ঔষধ আনিতে বলিবে ডাক্তারখানা হইতে। ঔষধের দামও পড়িবে টাকা-দুই।

কালী চৌধুরী বিরক্তির সঙ্গে আড়ত বন্ধ করিল, দরজায় চাবি লাগাইয়া দিল। একজন খরিদদার বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল দাওয়ায়। তাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কর্তা, আজ তোমার দর ঠিক হবে না। আজ যাও, রাত হয়েছে। কাল সকালে এসে ঘোষ মশায়ের সঙ্গে কথা বোলো।

ভাঙা সাইকেলটির চাবি খুলিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া চড়িয়া বসিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত, একটু একটু হাওয়া বহিতেছে মাঝে মাঝে। তাহার গ্রাম সাতবেড়ে, তিন মাইল পথ। বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ফেঁসোহাটির মাঠের মধ্যে এক মাইল কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে সাইকেল অচল, এখন কার্তিক মাসের শেষ, তাই ধূলা ঠেলিয়াও কোনোরকমে চালানো চলে। আট টাকা মহিনায় পোষায় এত? মাইল-টাক গিয়া মুচিপাড়া পার হইয়া বড় অশথগাছটা ছাড়িয়া কালী চৌধুরী সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িল।

রাস্তার ওপর ওটা কি পড়িয়া আছে? ন্যাকড়া-জড়ানো একটা বাস্তিলমত? কাছে গিয়া দেখিল নেকড়া-জড়ানো একটা বাস্তিলই বটে। ছোঁয়া ঠিক হইবে এই রাত্রিবেলা? শেষকালে বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিয়া মরিতে হইবে নাকি?

সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত দ্রব্যটি সে হাতে তুলিয়া লইল। ন্যাকড়ার গেরো খুলিয়া কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতে গেল—কাগজপত্র বলিয়া মনে হয়। দলিলপত্রের বাস্তিল কেহ ফেলিয়া গিয়াছে?

খুলিয়া দেখিয়া কিন্তু তাহার সর্বশরীর বিম্বিম্বি করিয়া উঠিল। হাত কাঁপিতে লাগিল। এই ঠাণ্ডা রাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্বনাশ! একশ' টাকার নোট—এক, দুই, তিন, চার...

কালী চৌধুরী সভয়ে রাস্তার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। পল্লীগ্রামের পথ, এত রাত্রে সম্পূর্ণ নির্জন। হাটবার হইলেও বা দু-একজন মানুষ দেখা যাইত। কেহ কোনো দিকে নাই আজ।

দশ...বিশ...ত্রিশ...চল্লিশ...পঞ্চাশ..পঞ্চাশখানা একশ' টাকার নোট। পঞ্চাশকে গুণ কর একশ' দিয়া। শন্য করতে শন্য...না দূর দূর—

উত্তেজনার মাথায় কালী চৌধুরী সহজ গুণ তুলিয়া গেল—একবার হইল পাঁচশ' একবার পঞ্চাশ হাজার। না, পাঁচ হাজারই বটে। বাস্তিলটা পুরানো ন্যাকড়ায় জড়ানো। নোট ছাড়া এক টুকরাও অন্য কোনো কাগজ নাই সঙ্গে। কাহারও নাম, কি কোনো চিঠি কি ঠিকানা—কিছু নাই। পাঁচ হাজার টাকা!

সে কুড়াইয়া পাইল এই অজ পল্লীগ্রামের পথে। কি সর্বনাশ! যে কালী চৌধুরী সামান্য আট টাকা মাহিনায় গিরীন ঘোষের আড়তে চাকুরি করে, এই যুদ্ধের বাজারে যাহার দুবেলা পেট পুরিয়া ভাত জোটে না, একখানা তুলো-জমানো কম্বল সাড়ে তিন টাকায় মেলে হারাধন বস্ত্রের কাপড়ের দোকানে কিন্তু পয়সার অভাবে কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না—চারটি ছেলেমেয়ে, বৌ, এক বৃদ্ধা পিসি, দুইটি গরু, তিনটি ছাগল, এক জোড়া পাতিহাঁস যাহার বাড়িতে—সেই আধময়লা কুষ্টিয়ার চাদর গায়ে দেওয়া কালীচৌধুরীর হাতে পড়িল পঞ্চাশখানা একশ' টাকার নোট—একটা আধুলি যাহার সঞ্চয় নাই, লক্ষ্মীর কাঠার মাথায় সিঁদুর মাখানো রূপোর টাকাটি ছাড়া!

বাস্তিলটা সে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে বাঁধিল। কেহ দেখে নাই তো? আর একবার সভয়ে চারিদিকে দেখিল।

না, রাস্তা সম্পূর্ণ জনহীন।

বাড়ি পর্যন্ত কোনোরকমে সাইকেল চলাইয়া চলিয়া আসিল কালী। পা-হাত ঠিকমত নিজের বশে নাই। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। মাথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কালী চৌধুরী কিছু ভাবে নাই। পাঁচ হাজার টাকা

তাহার কাপড়ের কেঁচায়, এই পর্যন্ত, এর বেশি আর সে কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। মাথায় তার কিছুই নাই এর বেশি বর্তমানে।

কালীর স্ত্রীর নাম ননীবালা। বাপের বাড়ি পাশের গ্রামে, সনেকপুর। খাঁটি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েমানুষ, আগে যা হোক চেহারা গড়ন-পিটন ভাল ছিল, এখন অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাও গিয়াছে।

কালীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—হুঁশ-পকো কবে হবে? যাবার সময় পই-পই করে না বললাম সরষের তেলের বোতলটা নিয়ে যাও—ত বোতলটা ফেলে গিয়েছ কি বলে? রান্না হয় নি তেলের অভাবে। এত রাত গেল—

কালী চৌধুরী অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—তেল নাই।

ননী রাগিয়া বলিল—থাকবে কোথেকে? পাঁচ ছটাক তেলে আজ দুবেলা চালাচ্ছি তিনটি দিন। তেল আনবার কথা তোমাকে বলে দিইনি? আজকাল কি গাঁজা ধরেছ নাকি? এ রকম করে সংসার করা আমার দ্বারা পোষাবে না বাপু। হ্যাঁগো, তোমার বগলে ওটা কি?

কালী চৌধুরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ও কাগজ।

—আড়তের?

—হ্যাঁ। এগুলো আমার ওই কাঠের হাতবাক্সটাতে রেখে এস তো।

পাঁচ হাজার টাকার বান্ডিলটা সেই চাবিভাঙা বাজে হাতবাক্সটার মধ্যে দিন পনের পড়িয়া রহিল, ননীবালা কোনো সন্দেহ করিল না, করিবার কথাও নয়। কালী চৌধুরীও যেন টাকার বান্ডিলের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। তাহার সংসারে যেমন অভাব-অনটন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ও টাকায় হাত পড়িল না।

এই পনের দিনের মধ্যে কালী চৌধুরী অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পরের টাকা ফেলিয়া গিয়াছে, যার টাকা সে যদি আসিয়া চায়, তবে এখনই বাহির করিয়া দিতে হইবে। নতুবা থানা পুলিশের হাঙ্গামা হইবে। খরচ করিয়া ফেলিলে, সে গরিব লোক, টাকা দিবে কোথা হইতে। দারোগা আসিয়া টানাটানি করিবে, হয়তো বাড়িঘর ফ্রোক করিবে। না, ও টাকায় হাত দেওয়া হইবে না। ননীবালাকেও কোনো কথা বলে নাই কালী চৌধুরী। মেয়েমানুষের মন, অতশত বুঝিবে না, টাকা খরচ করিবার তাগাদা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে।

এই সময় আসিয়া পড়িল বিপদ। বড় খোকা অসুখে পড়িয়া বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বাজারের বিনয় ডাক্তারের ডাক্তারখানায় পাঁচ ছ টাকা ওষুধের দাম বাকি পড়াতে সেখান হইতে ওষুধ আনা বন্ধ হইল। ননীবালার কানের একটা অল্প সোনার অলংকার বিক্রি করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল, ডাক্তারের ভিজিটের দাম শোধ দিয়া সামান্যই অবশিষ্ট রহিল তার। অথচ ছেলের জ্বর বন্ধ হয় না।

এ অবস্থায় ননীবালা একদিন কাঁদিয়া পড়িল স্বামীর কাছে। ছেলেকে যে করিয়া হোক বাঁচাইতে হইবে, জমিজমা সামান্য যাহা কিছু আছে বিক্রি করিয়া ডাক্তার দেখানোহউক।

কালী বলিল—আছে তো মোটে দু বিঘে ধানের জমি।

—ওগো ধানের জমি যায় যাক গো, ভিক্ষে করে খাব। তুমি খোকাকে বাঁচাও।

তাহাই হইল শেষ পর্যন্ত। খোকাও বাঁচিল না, ধানের জমিও গেল।

ননীবালা পুত্রশোকে ভাঙিয়া পড়িল। অনাহারশীর্ণ শরীরে ঢুকিল জোর ম্যালেরিয়া, চিকিৎসাপত্র চলে না, পথ্য জুটানোও দুষ্কর। কালী চৌধুরী একদিন সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নোটের বান্ডিল খুলিয়া ফেলিল। এক দুই তিন করিয়া গুনিল, পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে। এ তহবিল হইতে আপাতত কিছু ধার লইলে কেমন হয়? কিন্তু শোধ হইবে কেমন করিয়া? দশ বিশ টাকা লইলে মাহিনার টাকা হইতে শোধ দিবার কোনো উপায় নাই।

পুলিশ যখন আসিয়া বাড়ি ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া টাকা চাহিবে, তখন?

সেদিন ননীবালা অনেক রাতে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁগো, খোকা কদিন গিয়েছে?

কালী চৌধুরী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কেন, সে কথা কেন এখন? ও কথা বলে না।

—বল না গো?

—তা দু মাস।

—তাকে কোথায় দিয়েছিলে?

—ওই নদীর ধারে জামতলার শ্মশানে। তুমি ঘুমোও।

—না, শোন, তার ছিটের জামাটা গায়ে ছিল?

—সে কথা কেন এখন?

—বল না?

—ছিল।

—আমি জানি। শোন বলি।

—কি?

—খোকা এই জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ছিটের জামাটা গায়ে দিয়ে। সন্ধ্যাবেলা—

—ও সব কিছুর না। তুমি ঘুমোও।

—আমি দেখলাম যে—

—ও কিছুর না।

—খোকা আমায় ডাকছে। সে কি একটা বলছে আমি বুঝতে পারছি নে।

—আঃ, ঘুমোও না চুপটি করে। ও সব চোখের ভুল।

ননীবালা আর কোনো কথা বলিল না। কালী চৌধুরী ঠিক করিল, কাল সকালে নোটের বান্ডিল হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া খরচ করিবে। নোট পাইয়াছে আজ চার মাস। কেহ খোঁজ করে নাই এ পর্যন্ত। বোধ হয় কেহ খোঁজ করিবেও না।

পরদিন সকালে উঠিয়া কালী চৌধুরী বিমল ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যাইবে, স্নান করিয়া আসিয়া নোটের বান্ডিল খুলিবে এমন সময় সাইকেল চড়িয়া একজন অপরিচিত লোক উঠানে আসিয়া সাইকেল হইতে নামিল।

কালী দাওয়া হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চান?

লোকটা বলিল—এই কি কালীনাথ চৌধুরীর বাড়ি?

—হ্যাঁ, কেন?

আগন্তুক আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। নীচু স্বরে বলিল—আপনি টাকা পেয়েছিলেন কুড়িয়ে? সে আমার টাকা।

কালী চৌধুরীর বুকের মধ্যে টিপটিপ করিয়া উঠিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার টাকা?

—হ্যাঁ, সে আমার টাকা। আপনি বনগাঁয়ের মতি পালের আড়তে বলেছিলেন, টাকা কুড়িয়ে পেয়েছেন, যার টাকা সে এসে যেন নিয়ে যায়।

—হ্যাঁ, তা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার টাকা কি করে জানব? কি ভাবে টাকা হারালেন আপনি?

—পাট বেচে যাবার সময় গেঁজে থেকে পড়ে গিয়েছিল।

—বেশ। কত টাকা?

লোকটা ভাবিয়া বলিল—তিন হাজার।

কালী চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, বলছি। দু'হাজার—

—আজ্ঞে না—ও আপনার টাকা নয়। কিসে বাঁধা ছিল?

—ইয়ে—গেঁজেতে, না—রুমালে

—আজ্ঞে না।

লোকটা উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কড়াসুরে বলিল—তাহলে দেবেন না টাকা আপনি?

—না।

—বেশ, আমি থানায় গিয়ে বলি।

—যান। যার ন্যায্য টাকা আমি তাকে দেব বলে বসে আছি। নয়তো গল্প করে বেড়াইতাম না টাকার কথা। আপনার টাকা ও নয়।

লোকটি চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কালী চৌধুরীকে বড় ধাক্কা দিয়াই গেল। থানা পুলিশের ভয় দেখাইল। লোক আনিয়া মারধোর করিবার ইঙ্গিতও করিল। সুতরাং লোকটা চলিয়া গেলে কালী চৌধুরী নোটের বাউল হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া খরচ করিতে পারিল না। কালই পুলিশ আসিয়া যদি টাকা চায়, সে কোথা হইতে দিবে? পরের টাকা, তাহার তো নিজের নয়। কথায় বলে, ‘পরের সোনা দিয়ো না কানে’।

ননীবালা আরও দিন দশেক পরে ভুগিয়া ভুগিয়া ইহজগতের মায়া কাটাইল।

স্ত্রীর মৃত্যুর দু দিন পূর্বে টাকার কথাটা স্ত্রীকে বলি বলি করিয়া অবশেষে বলিয়া ফেলিল। ননীবালা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কত টাকা? পাঁচ হাজার?

—হ্যাঁ গো। পাঁচ হাজার।

—একটা কথা বলি। যখন ও টাকা খরচ করো নি এতকাল, তখন ওতে আর হাত দিয়ো না। পরের টাকা। আমি তো বাঁচবই না—

—কেন, তুমি খুব বাঁচবে, বাঁচবে—

—ওগো, আমি বাঁচব না। খোকা আমায় ডেকেছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি বৃদ্ধা পিসির হাতে মানুষ হইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধাও শোকের ঘায়ে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। বুড়ি একদিন বলিল—কালী, তুই আবার বিয়ে কর।

—কেন পিসি?

—তোর এমন বয়সটা কি? তা ছাড়া, এই বুড়ো বয়সে এত বড় সংসার আমি দেখতে পারি? বিয়ে কর তুই।

—খেতে দেব কি বিয়ে করে? তুমি পাগল, পিসি। ও আর হচ্ছে না। ছেলেমেয়েগুলো পর হয়ে যাবে।

বৈশাখের প্রথমে বৃদ্ধা পিসি কোথা হইতে এক সম্বন্ধ জুটাইয়া আনিলেন। তাহারা বর ও ঘরবাড়ি দেখিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—মশাই, আপনি অনেক টাকা কুড়িয়ে পেয়েছেন, একথা সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কত টাকা?

—তা বলব না। তবে অনেক টাকা।

—কতদিন পেয়েছেন?

—তা প্রায় এক বছর হতে চলল।

—কেউ আসেনি টাকা নিতে? আপনি তো অনেক জায়গায় বলেও রেখেছেন।

—মাঝে মাঝে লোক আসে। কিন্তু ঠিকমত বলতে পারে না কত টাকা। কি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাও বলতে পারে না। তা ছাড়া তাদের টাকা নয়, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ও সব জুয়োচোর।

—টাকা খরচ করেননি মোটেই?

—স্ত্রীর অসুখের সময় সামান্য কিছু। সে আমি যে করেই হোক পুরিয়ে দেব। ও টাকা আমার নয়, আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় বারণ করে গিয়েছে ও থেকে খরচ করতে। পরের টাকা গচ্ছিত আছে ভাবি। যার টাকা সে এসে নিয়ে যাক।

—আপনি বড় সাধুলোক দেখছি।

—সাধু-টাধু নই বাঁড়ুজ্যে মশাই। আগে খরচ করি নি পুলিশের ভয়ে। এখন খরচ করি না—আমার স্ত্রীর মরবার সময়কার কথা, তাই। সে আমায় বলে গিয়েছে যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে।

কন্যাপক্ষ এই সব শুনিয়েই বিবাহের জন্য কোনো আগ্রহ দেখাইল না। ওই টাকা বাদ দিয়ে কালী চৌধুরী নিঃস্ব লোক। একে দোজবরে পাত্র, তাহাতে গরিব লোক; এমন পাত্রে মেয়ে দিবার আগ্রহ যদি তাদের না থাকে, নিতান্ত দোষ দেওয়া চলে না।

একদিন পিসিমা বলিলেন—হ্যাঁরে কালী, এসব কি কথা শুনছি? তুই নাকি অনেক টাকা পেয়েছিস?

কালী বলিল—কে বললে?

—সকলেই বলছে—বলছে অত টাকা হাতে থাকতে ছেলেটা বউটাকে মেরে ফেললে। হ্যাঁরে, কথাটা সত্যি?

—হ্যাঁ পিসিমা।

বলিয়া কুড়ানো টাকার কথা সে সব ব্যক্ত করিল। পিসিমাও শুনিয়ে বলিলেন, বউ যখন বারণ করেছে তখন আর ওতে হাত দিতে হবে না এখন।

এদিকে বছর ঘুরিয়া গেল, কিন্তু টাকা চাহিতে কোনো লোক আসিল না বা থানা-পুলিশের হাঙ্গামাও হইল না। দু-একজন গায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, টাকাটা কোথায় আছে। কালী চৌধুরী বলিল—টাকা কি ঘরে রাখি? গিরীন ঘোষের আড়তে জমা আছে।

একবার তার বাড়ি সিঁদ হইয়া গেল।

আরও এক বছর ঘুরিয়া গেল। এই বছরে কালী চৌধুরীকে বিবাহ করিতে হইল পুনরায়। গরিবের ঘরের মেয়ে। কন্যাপক্ষ কালীকে দরিদ্র জানিয়াই বিবাহ দিল ও পাঁচ হাজার টাকার কোনো কথাই উঠিল না। টাকার বাড়িল সেই ভাঙা হাতবাক্সের মধ্যেই রহিল, নববধূ ক্রমশ দুইটি ছেলেমেয়ের মা হইল, সেও জানিতে পারিল না টাকার কথা। বৃদ্ধা পিসিমাও ইতিমধ্যে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

সুখে-দুঃখে এগারটি বছর কাটিয়া গিয়াছে।

কালী চৌধুরীর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলে দুটি রেলের চাকরিতে ঢুকিয়া দু-পয়সা আনিতেছে।

একদিন দুপুরবেলা কালী চৌধুরী স্ত্রীকে ডকিয়া বলিল—শোন একটা কথা—

স্ত্রী বড়ি শুকাইতে দিয়া কাক তাড়াইতেছিল বাহিরের রোয়াকে। কাছে আসিয়া বলিল—কি?

—ওই হাতবাক্সটা নিয়ে এস তো।

তারপর পুরানো কাগজপত্রের ভিতর হইতে নোটের বান্ডিলটা বাহির করিয়া বলিল—এদিকে এস। গোন।

স্ত্রী অবাক হইয়া নোট গুনিতে গুনিতে চুপি চুপি বলিল—হ্যাঁগা, এত টাকা কোথায় পেলে? কিসের টাকা এ?—সেই টাকা?

—তুমি এ টাকার কথা জান?

—কানাঘুষো শুনেছিলাম যখন প্রথম বিয়ে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।

—আমায় জিজ্ঞেস করোনি তো কোনোদিন?

—না। পিসিমা বারণ করেছিলেন। দিদির নাকি বারণ ছিল এ টাকায় হাত দিতে।

—এখন তোমার কি মত?

—ভাগ্যমানী স্বর্গে চলে গিয়েছেন বহুকাল। তাঁদের কাজে যখন আসেনি, তখন এ টাকায় আর হাত দিয়ে না। কার টাকা জানাও যায়নি।

—পরের ধন যক্ষির মত আগলে বসে আছি আজ এগার-বারো বছর। এখন ভেবেছি কি শোন। যদি তুমি মত দাও, তবে গ্রামে বড় জলকষ্ট, একটা পুকুর করে দিই এই টাকায়।

গ্রামের লোকের এতদিনের জলকষ্ট ঘুচিল।